দ্বিতীয় অধ্যায়

সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবিলায় যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে এর অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহের হালনাগাদ যে গতিধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে এ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.০ শতাংশ হবে বলে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-এ প্রাক্কলন করা হয়েছে। মন্দার প্রভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংকুচিত হলেও অন্যান্য বিকাশমান এশীয় অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি খুবই সীমিত। এসময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং রাজস্ব খাত ব্যবস্থাপনায় (fiscal management) শৃঙ্খলাও বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির সংকটের শুরু থেকেই সরকার দেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। সংকটের শুরুতেই সরকার এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও করণীয় নির্ধারণের জন্য বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের সুপারিশের আলোকে বিস্তারিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সরকার দু'টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। এ প্যাকেজের আওতায় রাজস্ব ও মুদ্রা খাতে নীতি সহায়তাও প্রদান করা হয়। এছাড়া, সামষ্টিক অর্থনীতিতে বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক স্বল্প-মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজস্ব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নীতি কৌশলসমূহ (fiscal responses) নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে একটি কারিগরি কমিটি কাজ করে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা, পূর্বাভাস ও ঝুঁকি

বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধার

২.২ বিশ্ব অর্থনীতি মন্দা কাটিয়ে প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াটি চলছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গতিতে। ২০০৯ সালে যেখানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ০.৬ শতাংশে সংকুচিত হয়েছিল সেখানে ২০১০ সালে তা ৪.২ শতাংশে পৌঁছানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে। অক্টোবর ২০০৯-এ World Economic Outlook-এর পূর্বাভাস অপেক্ষা বর্তমান পূর্বাভাসে প্রবৃদ্ধি ১.১ শতাংশ উর্ধ্বমুখী সংশোধন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের গভীরতর এ সংকট ২০০৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কেটে যেতে শুরু করে এবং উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি দ্রুত সংহত ও বিস্তৃত হতে থাকে। ২০১০ সালে উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০০৯ সালের ঋণাত্মক ৩.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩ শতাংশে পৌঁছানোর প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তবে উন্নত অর্থনীতির অধিকাংশ দেশেই পুনরুদ্ধারের এ প্রক্রিয়া হবে অনেকটা ধীরগতির আর বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তুলনামূলকভাবে দ্রুত প্রসারিত হবে। উন্নয়নশীল এশীয় অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে ভাল এবং এ অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০০৯ সালের ৬.৬ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ৮.৭ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় রাখার সক্ষমতার পাশাপাশি সংকট মোকাবিলায় সময়োপযোগী তৎপর নীতি, কৌশলই উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের অগ্রগতির অন্তর্নিহিত কারণ।

বিশ্ব বাণিজ্য

২.৩ বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ (world trade volume) ২০০৯ সালে ১০.৭ শতাংশে সংকুচিত হয়, যা ২০১০ সালে ৭.০ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৬.৩ শতাংশে সম্প্রসারণের প্রত্যাশা করা হয়েছে। ২০০৯ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি ও আমদানি যেখানে যথাক্রমে ১১.৭ শতাংশ এবং ১২.০ শতাংশ হ্রাস পায়, সেখানে ২০১০ সালে তা যথাক্রমে ৬.৬ শতাংশ এবং ৫.৪ শতাংশে উন্নীত হবার পূর্বাভাস করা হয়েছে। বিকাশমান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নত অর্থনীতির তুলনায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২০১০ সালে এ অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ এবং ৯.৭ শতাংশ হারে সম্প্রসারণের প্রত্যাশা করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি

২.৪ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট নিরসন শুরু সত্ত্বেও অধিকাংশ অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ এখনও সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। তবে প্রকৃত সামথ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পূর্ণমাত্রায় শুরু না হওয়া এবং সীমিত মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা ভবিষ্যতে মূল্যস্ফীতির চাপ সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারে। উন্নত অর্থনীতিতে শ্রমমজুরি বৃদ্ধির তুলনায় জ্বালানির মূল্য অধিক হারে বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির হার ২০০৯-এ ০.১ শতাংশ থেকে ২০১০-এ ১.৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। পুঁজি স্থানান্তর প্রবাহ (capital flow) বৃদ্ধির ফলে বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মূল্যস্ফীতি ২০০৯ সালের ৫.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০-এ ৬.২ শতাংশে দাঁড়ানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির ঝুঁকি

২.৫ বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুত্থান প্রক্রিয়ায় কিছু নিম্নমুখী ঝুঁকি এখনও রয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি উন্নত দেশের চলতি হিসাবে বিশাল আকারের ঘাটতি এবং জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশ ও চীনসহ কয়েকটি বিকাশমান অর্থনীতির চলতি হিসাবে বিশাল আকারে উদ্বৃত্ত বিশ্ব অর্থনীতিকে ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। এ ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার ব্যর্থতা বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে (regulatory system) নাজুক অবস্থায় ফেলতে পারে, যা মার্কিন ডলারের মূল্যমানের পতনসহ শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে পুনরায় সংকুচিত করতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নীতি নির্ধারণে সমন্বয়ের অভাবও বিশ্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রমকে বিলম্বিত করতে পারে। সরকারি ঋণের দ্রুত বৃদ্ধি রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে চাপের মধ্যে ফেলতে পারে যা পরবর্তীতে ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাকেও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করতে পারে। আর্থিক বাজার সংস্কারের যে এজেন্ডাসমূহ এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা না গেলে আর্থিক বাজার আবারও ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।

আন্তর্জাতিক পণ্যবাজার

২.৬ ২০০৯ সালের প্রথম দিকে বিশ্বব্যাপী পণ্যমূল্য দ্রুত হ্রাস পায়, অথচ পর্যাপ্ত চাহিদা তৈরি না হওয়া সত্ত্বেও বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে পণ্যমূল্য আবার বাড়তে শুরু করে। পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক মন্দাসমূহের ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য ধীর গতিতে হ্রাস পেয়ে মন্দা কেটে যাওয়ার পর আবার ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার শুরুতেই পণ্যমূল্যের এ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা ইতোপূর্বেকার মন্দা পরবর্তী অবস্থার তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য ২০০৮ সালের শেষ প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তুলনায় ২০০৯ এর প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) ২১.২ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ২০০৯ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) তা আবার ৩২.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। একই ধরনের গতিধারা কয়েকটি প্রাথমিক পণ্যের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

২.৭ ২০০৯ সাল এবং ২০১০ সালের প্রথম দিকে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির এ প্রবণতা ছিল পণ্য ভেদে ভিন্ন মাত্রার। জ্বালানি ও ধাতব দ্রব্যের মূল্য খাদ্য ও কৃষিভিত্তিক কাঁচামালের মূল্যের তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিস্থিতি ভাল থাকায় ২০০৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত প্রধান কয়েকটি প্রাথমিক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশসমূহের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের পণ্যমূল্য সূচক (ভিত্তি বছর: ২০০০) থেকে প্রতীয়মান যে, জ্বালানি মূল্যসূচক জানুয়ারি-মার্চ ২০০৯ এ ১৬৬.৩ এর তুলনায় জানুয়ারি-মার্চ ২০১০-এ ২৬২.২-এ পৌঁছে। অনুরূপভাবে একই সময়ের ব্যবধানে কৃষি পণ্যের মূল্য সূচক ১৮১.৯ থেকে ২১৬.৭-এ এবং ধাতব ও খনিজ দ্রব্যের মূল্যসূচক ১৮৫.০ থেকে ২৯৯.০-এ দাঁড়ায়। তবে একই সময়ের ব্যবধানে সারের মূল্যসূচক ৩৭৬.৬ থেকে ২৯৫.০ তে হ্রাস পায়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আরো প্রসারিত হবার প্রেক্ষাপটে পণ্যমূল্য আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে।

লেখচিত্র ২.১ঃ কতিপয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য (কোয়ার্টারভিত্তিক গড়)

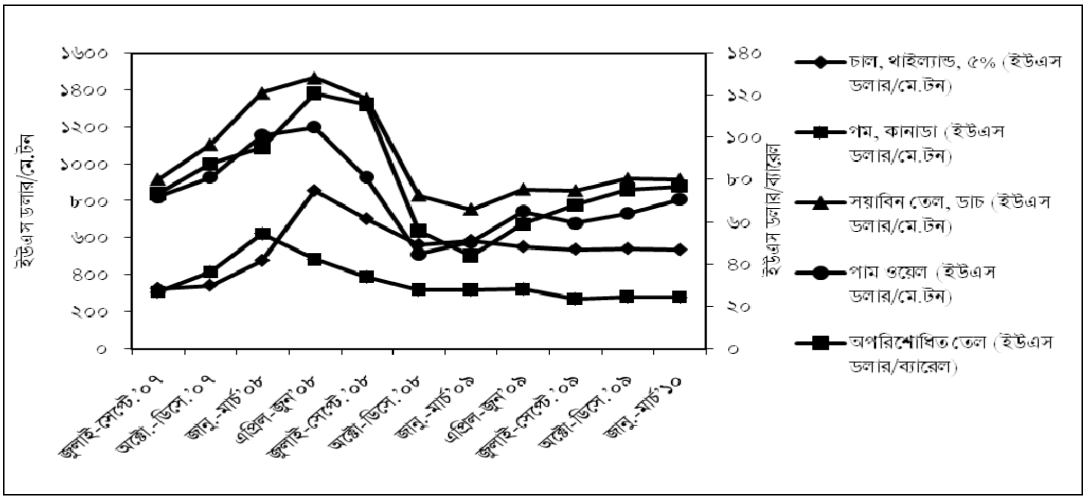

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ২০০৯-১০

২.৮ রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহের নিম্নমুখি ঝুঁকির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাসের আশংকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সন্তোষজনক অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক প্রাক্কলন করেছে ৫.৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী ২০০৮-০৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে অর্জিত প্রবৃদ্ধি (৫.৭ শতাংশ) থেকে সামান্য কম। বিবিএস এর প্রাথমিক প্রাক্কলনে সার্বিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও খরা ও পরবর্তীতে বন্যার কারণে কিছু এলাকায় ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আউশ ও বোরোর উৎপাদন সামান্য হ্রাস পেতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। ফলে কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত শস্য ও শাকশব্জি (crops and horticulture) উপখাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণে সার্বিক কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ৪.১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.০ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে বিবিএস এর প্রাথমিক হিসাবে অনুমান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে পর্যাপ্ত সার ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের ফলে কৃষির উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আউসের উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেলেও আমনের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী বেরোর উৎপাদনও ভাল হয়েছে। এছাড়া, কয়েকটি এলাকায় বন্যা হলেও বোরো উৎপাদনে এর খুবই সামান্য প্রভাব পড়েছে। এছাড়া, অন্যান্য ফসল ও শাকশব্জির উৎপাদনও সন্তোষজনক। এভিয়ান ফ্লুর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্ত থাকার কারণে পশুসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির ওপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়েনি। বনজ উপখাত এবং মৎস্য খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে চলতি অর্থবছরে সার্বিক কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ৪.৪ শতাংশ অর্জিত হবে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে (এমটিএমএফ) অনুমান করা হয়েছে।

২.৯ বৈশ্বিক অর্থনেতিক মন্দার কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি খাতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হলেও অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তা কেটে গেছে গেছে এবং জানুয়ারি ২০১০ থেকে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থবছরের শুরুতে তৈরী পোশাক খাতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারাও অনেকাংশে কেটে গেছে। এছাড়া, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, প্রকৌশল পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস ইত্যাদি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিশ্ব মন্দা কেটে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত আরও সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গৃহায়ন খাতে ব্যপক চাহিদার কারণে নির্মাণ খাতের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলে সাময়িক হিসাবে অনুমিত হয়েছে। ফলে সার্বিক শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ২০০৮-০৯ এর ৬.৫ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ৬.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে এমটিএমএফ-এ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২.১০ সার্বিক সেবা খাতের বিভিন্ন খাতে প্রবৃদ্ধির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক সেবা খাতের মধ্যে হোটেল ও রেঁস্তোরা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ইত্যাদি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বাড়বে মর্মে সাময়িক প্রাক্কলন থেকে অনুমিত হয়েছে। পক্ষান্তরে

বিপণন, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ এবং আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির তুলনায় হ্রাস পেতে পারে। সার্বিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ৬.৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৬.৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে সাময়িক হিসাবে প্রাক্কলিত হয়েছে।

২.১১ ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাময়িক হিসাবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি'র ০.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৮০.২ শতাংশে পৌঁছেছে। রেমিট্যান্স প্রভাবিত (remittance induced) চাহিদা এবং সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা ছিল ইতোমধ্যে তা কাটতে শুরু করেছে। মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ব্যয় এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহে আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৪.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৪.৬ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে এমটিএমএফ-এ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, ২০১১-২০১৫

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ

২.১২ মন্দা থেকে বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত বেরিয়ে আসা, কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় থাকার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করা হয়েছে। যে নীতি চলকসমূহের (policy variables) ওপর ভিত্তি করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ), ২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫ প্রণীত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ রাজস্ব আহরণ, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়, বেসরকারি বিনিয়োগ, ঋণের যোগান সম্প্রসারণ এবং স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় হার। সারণি ২.১-এ এমটিএমএফ এর প্রধান চলকসমূহের প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে। এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিস্তারিত আলোচনা (প্রকৃত খাত, মুদ্রা খাত ও বৈদেশিক খাত) এবং তৃতীয় অধ্যায়ে রাজস্ব খাতের বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ২.১: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ), ২০১১-২০১৫

[redacted]

প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাস

২.১৩ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৬.৭ শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছর নাগাদ ৮.০ শতাংশে উন্নীত করা এবং পরবর্তী অর্থবছরেও তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অর্থনীতির তিনটি বৃহৎ খাত, যথা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত ব্যাপকভিত্তিক অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে কৃষি খাতে গড়ে ৪-৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রত্যাশা করা হয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ (crop intensity) এবং শস্য বহুমুখীকরণের (crop diversity) ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার যে ব্যাপকভিত্তিক সহায়তা প্রদান করছে তা হলো:

- কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান
- সেচ কাজে নির্বিঘ্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ
- কৃষি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেচ কাজে সোলার বিদ্যুৎ -এর ব্যবহার
- কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার
- লবণাক্ততা ও বন্যার পানি সহনীয় ধানের জাত উদ্ভাবন
- কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান

২.১৪ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ২০১০-১১ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ দু'অংকে উন্নীত করার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি, কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

- সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ক্রমান্বয়ে জিডিপি'র ৬.০ শতাংশে উন্নীত করা। এতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিবেশ (crowding in private sector investment) আরো অনুকূল হবে।
- পিপিপি উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতের বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন
- বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে জিডিপি'র ৩২.০ শতাংশে উন্নীত করা

২.১৫ সেবা খাতও কৃষি ও শিল্প খাতের সাথে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়েছে। সেবা খাতের মধ্যে ব্যবসা বণিজ্য প্রসারের কারণে বাণিজ্য, চাহিদার কারণে গৃহায়ন, ক্রমবর্ধমান অটোমেশন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে সেবা খাত প্রতি বছর ৬.৫ শতাংশ থেকে ৮.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমিত হয়েছে।

২.১৬ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অব্যাহত রেমিট্যান্স প্রবাহের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে ভোগব্যয় এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে এবং রপ্তানি পণ্য বৈচিত্রকরণ ও পণ্যের বাজার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির পথে অর্থনীতি পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

মূল্যস্ফীতি

২.১৭ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের দ্রুত হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতির ফলে জুলাই ২০০৮-এ মূল্যস্ফীতির হার ১০.৮ শতাংশ থেকে জুন ২০০৯-এ ২.৩ শতাংশে হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বার্ষিক গড়

মূল্যস্ফীতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৯.৯ শতাংশ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৬.৭ শতাংশে নেমে আসে। এসময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির তুলনায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হার বেশি হ্রাস পায়। তবে জুন ২০০৯ থেকে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বার্ষিকভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০০৯-এ ২.৩ শতাংশের তুলনায় মার্চ ২০১০ মাসে ৮.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার মার্চ ২০১০-এ ১০.৮ শতাংশে পৌঁছেছে, যা জুন ২০০৯-এ ছিল ০.৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির হার জুন ২০০৯-এ ৫.৯ শতাংশের তুলনায় সামান্য হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০০৯-এ ৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (লেখচিত্র ২.২)। মূলত খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে শহরাঞ্চলের মূল্যস্ফীতির (৮.৭ শতাংশ) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্ফীতির হার (৮.৮ শতাংশ) কিছুটা বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ আমদানিতব্য অন্যান্য পণ্যসামগ্রির মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য, উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রভাবে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির এ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে।

লেখচিত্র ২.২ঃ জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

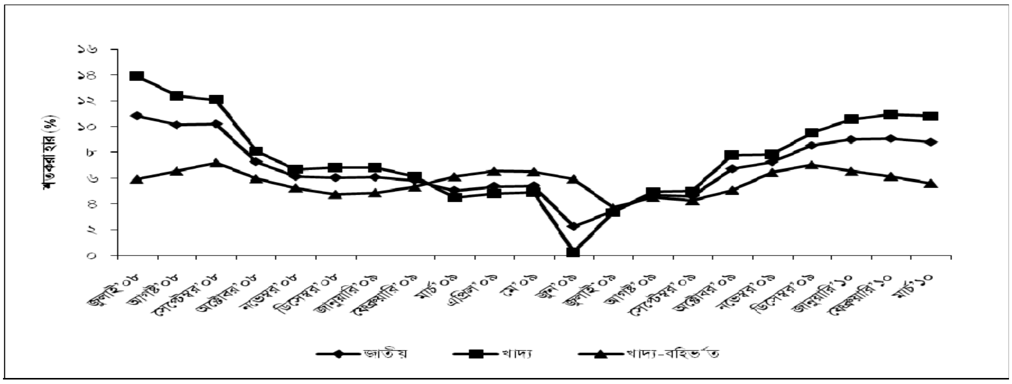

২.১৮ মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে পণ্য সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখা, খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রয় (ওএমএস) এবং বাজার ব্যবস্থা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবাহের কারণে ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি মাধ্যমে যাতে মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না হয় সেজন্য অতিরিক্ত তারল্য প্রত্যাহারের (liquidity mop-up) লক্ষ্যে সংকুলানমুখী (accommodative) মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ তফসিলি ব্যাংকসমূহের নগদ জমা সংরক্ষণ হার (Cash Reserve Requirment-CRR) ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৫.৫ শতাংশ এবং সংবিধিবদ্ধ জমার হারও (Statutory Liquidity Ratio-SLR) ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৮.৫ শতাংশ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতির হার ৬.৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আশা করা যায়। পরবর্তী অর্থবছরসমূহে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমানৃয়ে হ্রাস করে ২০১৪-১৫ অর্থবছর নাগাদ ৫.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

২.১৯ চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের তুলনায় ২৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে (জিডিপি'র ১১.৫ শতাংশ) বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মোট সরকারি ব্যয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২৬.৪ শতাংশ বেশি প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে মোট সরকারি ব্যয় দাঁড়াবে জিডিপি'র ১৬.০ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের মোট ব্যয় অপেক্ষা জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ বেশি। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে

জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নির্বাহ করা হবে ২.৫ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ২.০ শতাংশ নির্বাহ করা হবে বৈদেশিক উৎস থেকে।

২.২০ ২০০১৩-১৪ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে আগামী চার অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ আরো ২.১ শতাংশ অর্থাৎ প্রতিবছর গড়ে ০.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। পাশাপশি বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় চলতি অর্থবছরের জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ থেকে ৬.১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসময়ে মোট ব্যয় জিডিপি'র ১৭.৮ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.১ শতাংশে পৌছাবে। বাজেট ঘাটতি এ সময়ে ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। রাজস্ব আহরণ ও সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত

মুদ্রানীতি

২.২১ বাংলাদেশ ব্যাংকের ষাণ্মাসিক মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রের (Monetary Policy Statement) অষ্টম ও নবম ইস্যুতে চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতির রূপরেখা বিবৃত হয়েছে। উভয় ঘোষণাপত্রে মূল্য পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে রেখে টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক (supportive) মুদ্রার সম্প্রসারণকে বিবেচনায় এনে মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। চলমান অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখার জন্য সহায়ক ঋণ প্রবাহ বজায় রাখার পাশাপাশি মুদ্রানীতিতে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতে (SME) ঋণ যোগানের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২.২২ বার্ষিকভিত্তিতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬.০ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২১.৮ শতাংশ। এসময়ে বিশ্বমন্দা এবং বিনিয়োগ পরিস্থিতির স্থবিরতার কারণে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২৪.৯ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়ে ১৪.৬ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সরকারি খাতে নীট ঋণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৩০.৪ শতাংশের তুলনায় ২৪.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ মাস শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি পুনরায় হ্রাস পেয়ে ১৩.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধির কারণে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো মার্চ ২০১০ শেষে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পেয়েছে ১০.৬ শতাংশ। সঞ্চয়পত্র থেকে নীট বিক্রয় বেশি হওয়ায় এবং বৈদেশিক উৎস থেকে এবছর তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থ প্রাপ্তির কারণে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ হ্রাস পেয়েছে। ফলে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। বার্ষিকভিত্তিতে মার্চ ২০১০ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯.৫ শতাংশ, যা গত অর্থবছরের তুলনায় অনেক বেশি।

২.২৩ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০১১-২০১৫ অর্থবছর পর্যন্ত গড়ে প্রায় ১৮.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৮.২ শতাংশ এবং এর পরবর্তী চার অর্থবছরে (২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত) ১৯.৫ শতাংশের মধ্যে থাকার পূর্বাভাস করা হয়েছে।

মুদ্রা সরবরাহ

২.২৪ ব্যাপক মুদ্রা (এম২) সরবরাহ ২০০৮-০৯ অর্থবছর শেষে ১৯.২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৬ শতাংশ। বছরভিত্তিতে ২০০৯-১০ অর্থবছরের মার্চ মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায়

২১.৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের মার্চ মাস শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৮ শতাংশ। এসময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা এবং ব্যাংক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য তুলে নেয়ার জন্য (steralize) মুদ্রা বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করার ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে ৭০.০ শতাংশ। অন্যদিকে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ১০.৭ শতাংশ। চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ১৫.৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৬.০ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

সুদের হার

২.২৫ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের শেষে এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম দিকে মুদ্রা বাজারে তারল্য পরিস্থিতি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরায় রিভার্স রেপোর কার্যক্রম শুরু করে। এসময়ে রেপোর (১-২ দিন মেয়াদি) সুদের হার সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর ৮.৫ শতাংশ থেকে নভেম্বর ২০০৯-এ ৪.৫ শতাংশে নেমে আসে এবং এ হার মার্চ ২০১০ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে রিভার্স রেপোর (১-২ দিন মেয়াদি) সুদের হার মার্চ ২০০৯ এর ৬.৫ শতাংশের তুলনায় অক্টোবর ২০০৯-এ ২.৫ শতাংশে নেমে আসে এবং মার্চ ২০১০ পর্যন্ত এ হার অব্যাহত রয়েছে। মুদ্রা বাজারে তারল্য পরিস্থিতির ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক কলমানির (Call Money) ভারিত সুদের হার মার্চ ২০১০-এ ৪.৫ শতাংশে পৌঁছেছে যা জুলাই ২০০৯-এ ১.১ শতাংশ ছিল। এছাড়া ৯১-দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারিত সুদের হার জুলাই ২০০৯-এ ১.৯ শতাংশ থেকে জানুয়ারি ২০১০ তে ২.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে ১৮২-দিন মেয়াদি এবং ৩৬৪-দিন মেয়াদি ট্রেজারী বিলের ভারিত সুদের হার বিগত কয়েক মাস যাবৎ (অক্টোবর ২০০৯ থেকে) মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারী বিলসমূহের (৫-বছর, ১০-বছর, ১৫-বছর ও ২০-বছর) ভারিত সুদের হারও এসময়ে প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে।

২.২৬ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অতিরিক্ত তারল্য হ্রাস করা এবং বিনিয়োগকারীদেরকে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ঋণ গ্রহণকে সহজতর করার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে ক্রেডিট কার্ড, গৃহায়ন এবং ভোক্তা ঋণ ব্যতীত অন্যান্য খাতে ঋণের সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা ১৩ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়, যা পরবর্তীতে পুনরায় ১১ শতাংশে হ্রাস করা হয়। তবে ঋণ প্রদানের সুদের হারের উর্ধ্বসীমা কমার সাথে সাথে আমানতের সুদের হারও হ্রাস পায়। ফলে সুদের হারের ব্যাপ্তি (spread) প্রায় অপরিবর্তিত থাকে (লেখচিত্র ২.৩)।

২.২৭ ভারিত গড় (weighted average) ঋণ প্রদানের সুদের হার জুন ২০০৮-এ ১১.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৯-এ ১৩.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময়ে ভারিত গড় আমানতের সুদের হার ৮.৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে জুন ২০০৮-এ সুদের হারের বাপ্তি ৪.৩ শতাংশ থেকে ০.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০০৯-এ ৫.২ শতাংশে পৌঁছে। ভারিত গড় ঋণ প্রদানের সুদের হার পরবর্তীতে আরো হ্রাস পেতে থাকে এবং মার্চ ২০১০-এ তা ১২.৪ শতাংশে হ্রাস পায়। একইসাথে ভারিত গড় আমানতের সুদের হারও হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১০ তে ৭.১ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে সুদের হারের ব্যাপ্তি পুনরায় ০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১০-এ ৫.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। মূল্যস্ফীতির হার বিগত কয়েকমাসে কম থাকায় আমনতের ওপর প্রকৃত সুদের হার ধণাত্মক ছিল যা মূল্যস্ফীতি হার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ঋণাত্মক হবে।

লেখচিত্র ২.৩ঃ ভারিত গড় ঋণ ও আমানতের সুদের হারের গতিধারা

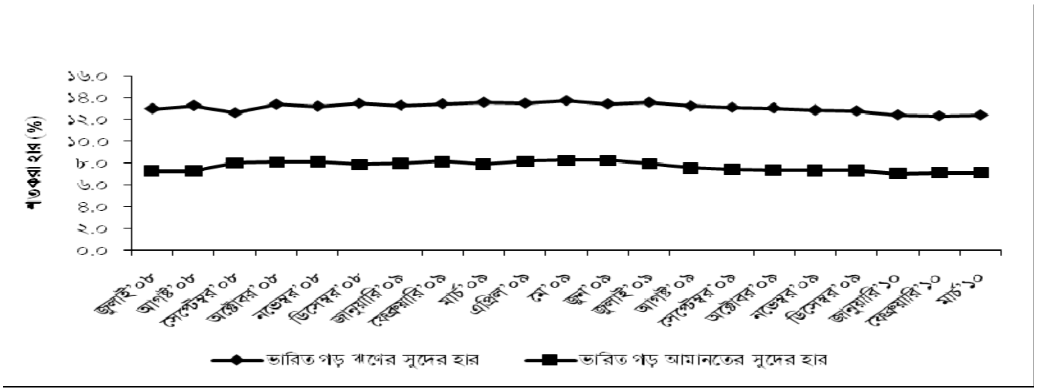

পুঁজিবাজার

২.২৮ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পুঁজিবাজার পরিস্থিতির কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও চলতি ২০০৯-১০ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এসময়ে পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও মূল্য সূচকের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বাজার মূলধন জুন ২০০৯-এ ১,২১০.৩ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ২১.৪ শতাংশ) থেকে ৯৫.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এপ্রিল ২০১০-এ ২,৩৬০.৫ বিলিয়ন টাকায় (জিডিপি'র ৩৪.২ শতাংশ) দাঁড়ায়। এ সময়ে ডিএসই'র সাধারণ মূল্যসূচক ৩০১০.৩ থেকে ৮৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৬৫৪.৯-এ দাঁড়ায়।

২.২৯ বিও (Benificiery Owners) একাউন্টের সংখ্যা জুন ২০০৯-এ ১.৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এপ্রিল ২০১০-তে ২.৫ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। Price Earnings (P/E) Ratio জানুয়ারি ২০০৯-এর ১৮.৩ থেকে বেড়ে মার্চ ২০১০-এ ২৭.৬ এ দাঁড়িয়েছে। মার্চ ২০১০ সময়ে কয়েকটি দেশের P/E Ratio ছিল-পাকিস্তন: ৮.০, থাইল্যান্ড (ব্যাংকক): ১০.০, ইন্দোনেশিয়া: ১৩.০, হংকং: ১৬.০, শ্রীলংকা: ১৮.৫, মালয়েশিয়া: ২০.০ ও ভারত (মুম্বাই): ২০.৬। ঢাকার পুঁজিবাজারের এ উচ্চ P/E Ratio পুঁজিবাজার থেকে জনগণের অধিক লাভের প্রত্যাশারই প্রতিফলন, যা পুঁজিবাজারকে প্রায়শ অস্থিতিশীল করেছে।

২.৩০ পুঁজিবাজারের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখতে এবং পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিসহ নতুন নতুন কোম্পানির অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সরকার সচেতন রয়েছে। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৫টি কোম্পানির শেয়ার পুঁজিবাজারে এসেছে এবং আরো ২৬ টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার অফলোডিং এর প্রক্রিয়া চলছে। পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) নানাবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: সার্বিক নজরদারি ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা, মার্জিন লোন-এর পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ, মৌলভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানির বাজারে আসার সুবিধার জন্য বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিও মূল্য নির্ধারণের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া, তালিকাচ্যুত কোম্পানিসমূহের সিকিউরিটিজকে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ করে দিতে ডিইসিতে সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে ওভার-দি-কাউন্টার (ওটিসি) মার্কেট চালু করা হয়েছে। দেশের পুঁজিবাজারের কাঠামো আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট' স্থাপন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার চলতি অর্থবছরে ১০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২.৩১ ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের উচ্চ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (৪২.৪ শতাংশ) অপেক্ষা ১১.৭ শতাংশ হ্রাস পায়। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই প্রান্তিকের তুলনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যথাক্রমে ১.০ শতাংশ এবং ৯.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (এপ্রিল ২০১০ পর্যন্ত) রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় ১.০ শতাংশ। এসময়ে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ওভেন পোশাক ২.১ শতাংশ এবং নীট পোশাক ১.৪ শতাংশ হ্রাস পায়। হিমায়িত খাদ্যের প্রবৃদ্ধিও এসময়ে হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, কাঁচা পাট, পাটজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, চামড়া ইত্যাদির প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। রপ্তানি খাতে বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে বর্তমানে নতুন সরবরাহ আদেশ পাওয়া যাচ্ছে এবং মন্দা পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের গন্তব্যস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানি পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২.৩২ এ প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০১১-২০১৫ অর্থবছরে গড়ে প্রায় ১৬.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। রপ্তানি খাতে দীর্ঘ মেয়াদে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য পণ্য বৈচিত্রকরণ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের মূল কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রপ্তানি খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ঘোষিত দু'টি প্রণোদনা প্যাকেজে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো: (ক) নগদ সহায়তা প্রদান, (খ) ঋণ পুনতফসিলিকরণ, (গ) সুদের হার হ্রাস, (ঘ) পূর্ব নীরিক্ষা ছাড়াই নগদ সহায়তার ৭০ শতাংশ ছাড়করণ, (ঙ) নতুন পণ্য এবং নতুন বাজারে রপ্তানির ওপর নগদ সহায়তা প্রদান।

আমদানি

২.৩৩ ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আমদানি পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (প্রবৃদ্ধি ৩৪.৯ শতাংশ) অপেক্ষা ১৯.০ শতাংশ হ্রাস পায়। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে আমদানি প্রবৃদ্ধি ঘুরে দাঁড়ায় এবং পূর্ববতী অর্থবছরের অনুরূপ প্রান্তিকের তুলনায় আমদানি বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৯.৯ শতাংশ এবং ৭.৩ শতাংশ। ফলে চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত প্রথম নয় মাসে আমদানি প্রবৃদ্ধির ঋণাত্মক ধারা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বর্তমানে ঋণাত্মক ১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে জুলাই-মার্চ সময়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.৬ শতাংশ, যা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া, একই সময়ে ঋণপত্র খোলার ভিত্তিতে শিল্পের কাঁচামাল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৯.৬ শতাংশ ও ১৩.৯ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে চলতি অর্থবছরে আমদানি প্রবৃদ্ধি ৬.০ শতাংশ অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে ২০১১-২০১৫ অর্থবছরে আমদানি গড়ে ১৮.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স

২.৩৪ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ২২.৪ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম দশ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ এসেছে ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ বেশি। তবে এসময়ে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি প্রায় ৩৬.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছরের জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতিধারা থেকে দেখা যায় যে বিগত কয়েক বছরের সাধারণ ধারার (normal trend) তুলনায় এ হার অনেক বেশি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স আসে ৬.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ২৪.৫ শতাংশ বেশি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। একইভাবে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানি পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২.৯১ লক্ষ)

তুলনায় ৫১.০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৬ লক্ষে দাঁড়ায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ সংখ্যা আরো ৭৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৮ লক্ষে দাঁড়ায়। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানির এ হার ৩৩.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৬.৫ লক্ষে পৌঁছে।

২.৩৫ বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রধান অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরে কিছুটা শ্লথ হলেও চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধির পূর্বাভাস করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে অধিকাংশ বাংলাদেশি কর্মী অদক্ষ/আধা-দক্ষ, যারা মূলত নির্মাণ কাজে নিয়োজিত। ফলে এসব দেশে বাংলাদেশের কর্মীদের চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা রয়েছে। সরকার এসব দেশে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণে উৎসাহ দিচ্ছে। অধিকন্তু বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও তা ধরে রাখার উদ্দেশ্যে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য National Skill Development Council-কে কার্যকর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি ১৮.৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পরবর্তী বছরসমূহে গড়ে ২২.০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য

২.৩৬ জুলাই-মার্চ, ২০১০ সময়ে বাণিজ্য ঘাটতি গত অর্থবছরের একই সময়ের ঘাটতির চেয়ে ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধি, পণ্য বাণিজ্য ও সেবা খাতে ঘাটতি হ্রাসের কারণে এ সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে, গত অর্থবছরের একই সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-মার্চ, ২০১০ সময়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণের উচ্চ প্রবৃদ্ধি (৩৬.৪ শতাংশ) সত্ত্বেও অন্যান্য কয়েকটি খাতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মূলধন ও আর্থিক হিসাব ঋণাত্মক হয়। তা সত্ত্বেও সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত এসময়ে গত অর্থবছরের ১.০ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

লেখচিত্র ২.৪ঃ চলতি হিসাবে ভারসাম্য ও সার্বিক ভারসাম্য

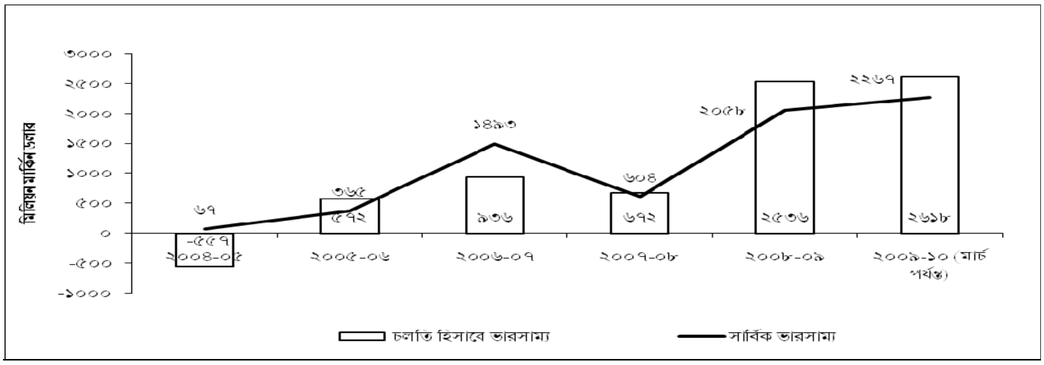

২.৩৭ ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি ৪.৭ শতাংশে দাঁড়ানোর প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪.৯ শতাংশ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫.৪ শতাংশে দাঁড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির তুলনায় আমদানি প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। চলতি হিসাবে ভারসাম্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশে পৌঁছানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে, যা রেমিট্যান্স প্রবাহের স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির কারণে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে দাঁড়ানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ

২.৩৮ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এপ্রিল ২০১০ মাস শেষে ১০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে যা প্রায় ৫.৭ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। এপ্রিল ২০০৯ মাস শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা প্রায় ৩.৪ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। চলতি

২০০৯-১০ অর্থবছর শেষে রিজার্ভের পরিমাণ ১০.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা দ্বারা ৪.৯ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌঁছানোর পূর্বাভাস করা হয়েছে এবং এতে প্রায় ৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব হবে।

বিনিময় হার

২.৩৯ চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার মোটমুটি স্থিতিশীল ছিল এবং এসময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় টাকার বিনিময় হার ডলারপ্রতি ০.৬ শতাংশ হ্রাস পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা বাজার থেকে মার্কিন ডলার ক্রয় করায় টাকার সাথে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। এসময়ে বাণিজ্য সহযোগী কয়েকটি দেশের মুদ্রা, যথা: ইউরো (৪.৩ শতাংশ), চীনের উয়ান (০.৭ শতাংশ), জাপানের ইয়েন (৮.১ শতাংশ) এবং ভারতীয় রুপি (৮.০ শতাংশ)-র তুলনায় টাকার অবচিতি (depreciation) ঘটে, তবে পাউন্ড ষ্টালিং-এর তুলনায় (০.৯ শতাংশ) টাকার উপচিতি (appreciation) ঘটে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে টাকা-মার্কিন ডলারের গড় বিনিময় হার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৬৯.৫ টাকা। মধ্যমেয়াদে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার বর্তমান বিনিময় হার নীতি আলোকে স্বল্প হারে অবচিত হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে

২.৪০ টাকার নামিক কার্যকর বিনিময় হার (Nominal Effective Exchange Rate-NEER) এবং প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate-REER) সূচক ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের তুলনায় ২০০৯-এ মাঝামাঝি সময়ে অবচিতি ঘটলেও বর্তমানে উভয় সূচকের উপচিতি ঘটেছে (লেখচিত্র ২.৫)। টাকার নামিক (nominal) বিনিময় হার প্রায় একই থাকায় REER সূচকের উপচিতির ফলে দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের ওপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তা সত্ত্বেও টাকার কার্যকর বিনিময় হার নামিক বিনিময় হার অপেক্ষা কম থাকায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ এখনও রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছে।
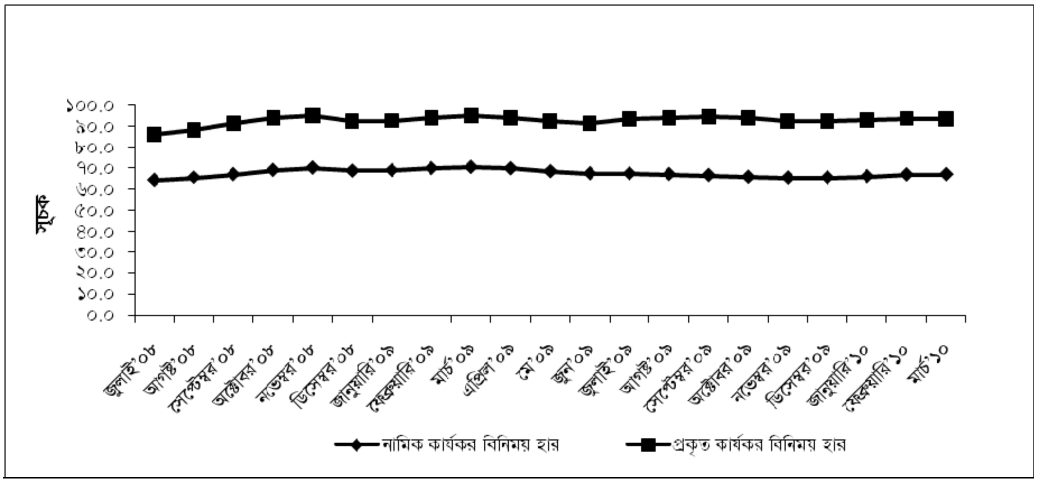
লেখচিত্র ২.৫ঃ নামিক কার্যকর বিনিময় হার সূচক এবং প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক